গল্পগাছা

সমরেশ মজুমদার

গল্প এক

ক. আমার এখন কোনও বোধশক্তি নেই। শরীরটাকে এখনও শরীর বলা যায় না। চোখ, নাক, ঠোঁট নেই, মাত্র আড়াই মাসে আমার শরীর যেটুকু গড়ন পাওয়ার তার বেশি পায়নি। তাই যদি আমি শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারতাম তা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারতাম না। সেই সব শব্দ যদি বাতাসে থেকে গিয়ে থাকে তা অনেকটা এই রকম—

নারীকণ্ঠ ॥ আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করেছিলাম, তুমি শোননি। কিন্তু এখন আমার পক্ষে বাচ্চা ক্যারি করা অসম্ভব। সবে প্রমোশন হয়েছে, প্রচণ্ড কাজের চাপ। আমি কালই এর হাত থেকে মুক্তি চাই।
পুরষকণ্ঠ ॥ ও কে, ও কে সব ঠিক। কিন্তু আমাদের বিয়ে আট বছর পেরি য়েছে। তোমারও বয়স হয়েছে। প্লিজ এটা কনসিডার করো। কোনও রকে ম সময়টা ম্যানেজ করো।

পুরুষকণ্ঠের আবেদনে বোধহয় কাজ হয়েছিল। কারণ, আমার শরীর বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

খ. এখন আমার শরীরের বয়স পাঁচ মাস। যদিও অনেক কিছু তৈরি হতে বাকি, তবু যেন মানুষের আদল পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখনও আমার বোধশক্তি

তৈরি হয়নি। ঝিম মেরে পড়ে থাকি। তবু এক রাত্রে সংলাপগুলো শুনতে পেলাম, কিন্তু বুঝতে পারার স্তরে পৌঁছায়নি।

নারীকণ্ঠ ।। ডক্টর চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলেছ?
পুরুষকণ্ঠ ।। হ্যাঁ। কিন্তু উনি রাজি হচ্ছেন না।
নারীকণ্ঠ ।। কেন?
পুরুষকণ্ঠ ।। বললেন, এটা এখন সম্পূর্ণ বেআইনি। পেটে যে আছে তার লিঙ্গ জন্মাবার আগে নির্ধারণ করা যাবে না।
নারীকণ্ঠ ।। আশ্চর্য! আমার পেটে যে আছে তার পরিচয় আমি জানব না?
পুরুষকণ্ঠ ।। জেনে কী করবে? অপছন্দ হলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে।

মানে বুঝলে আমি কেঁপে উঠতাম। আমি কী হলে নারীকণ্ঠের পছন্দ হবে?

গ. এখন আমার সাত মাস বয়স। শরীর তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অনুভব শক্তি আসেনি। সব সময় ঘুমাই। হঠাৎ একদিন হই হই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কথাগুলো কানে আসছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। তবে উচ্ছ্বাসের একটা দোলা আমাকেও ছুঁয়ে গেল।

অন্য নারীকণ্ঠ ।। না বললে শুনব না, খেতে হবে আজ।
চেনা নারীকণ্ঠ ।। অসম্ভব! আমি কি রাক্ষস?
আর এক নারীকণ্ঠ ।। এম্মা, তুই যা ভালবাসিস তাই তো দেওয়া হয়েছে, শুরু কর। আজ তোর সাধ, সাধ মিটিয়ে খেয়ে নে।

সাধ মিটিয়ে খেতে বলল কেন? আমার জন্যে কোনও বিপদ? বুঝতে পারি নি বলে মন খারাপ হয়নি।

ঘ. এখন আমার আট মাস বয়স পূর্ণ হল। কিন্তু এ আমি কোথায় আছি? আমার চারপাশে নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত জল। দমবন্ধ হয়ে আসছে মাঝে মাঝে। আমার শরীর এখন সম্পূর্ণ। আমি অনুভব করতে পারছি, বুঝতে পারছি। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বেরুবার জন্যে হাত পা ছুড়ছি। আমাকে বেরুতেই হবে। কিন্তু হঠাৎ পরিচিত স্ত্রীকণ্ঠের আদুরে হাসি কানে এল।

স্ত্রীকণ্ঠ ।। দ্যাখো, দ্যাখো, কী দুষ্টু, হাত ছুড়ছে। এখানে, এখানে টাচ করো!
পুরুষকণ্ঠ ।। উঁচু হয়ে উঠেছে। যাঃ, মিলিয়ে গেল। বেশ দুরন্ত হবে বলে মনে হচ্ছে।

আমি হতভম্ব। ওরা এত নির্বোধ কেন? আমার কষ্টতে ওরা মজা পাচ্ছে?

ঙ. আমার বয়স নয় মাস হওয়ার কদিন পরেই আচমকা পুতিগন্ধময় জল বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করল। আমি প্রাণপণে অন্ধকার থেকে আলোয় আসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার গলায় কিছু জড়িয়ে গিয়ে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। অন্ধকারের দিকে পিছিয়ে গেলে ফাঁসটা আলগা হচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছি। তখন সমানে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসছে। আমি বের হতে চাই কিন্তু বেরুলেই ফাঁস গলায় চেপে বসছে। আমি কী করব?

পুরুষকণ্ঠ ।। ডক্টর চ্যাটার্জি, কী অবস্থা?
অন্য কণ্ঠ ।। খুব খারাপ। আমাদের একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে! দেখুন, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বেবিকে বাঁচাতে গেলে মায়ের জীবন সংশয় হবে। আবার মাকে বাঁচালে বেবি বাঁচবে না।
পুরুষকণ্ঠ ।। সে কী!
অন্য কণ্ঠ ।। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ ব্যাপারে।
পুরুষকণ্ঠ ।। দু'জনকেই বাঁচানো যাবে না?
অন্য কণ্ঠ ।। আগে সম্ভব ছিল, এখন নয়।
পুরুষকণ্ঠ ।। বেশ, আপনি আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিন।

আমি আমার ইচ্ছেয় এই অন্ধকার গহ্বরে আসিনি। সেই আড়াই মাস বয়স থেকে প্রতিনিয়ত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। এই মুহূর্তে আমি টান অনুভব করলাম। অবাঞ্ছিত এই আমাকে এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে ছুড়ে ফেলা হবে এখনই!

গল্প দুই

গোটা চারেক যাত্রীকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেল স্টেশন ছেড়ে। একেবারে মফস্‌সলি স্টেশন। স্যুটকেস হাতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এক জন যেচে এগিয়ে এল, 'কোথায় যাবেন বাবু?'
'হৃদয়পুর বাসস্ট্যান্ড কত দূরে?'

লোকটি হাসল। 'বাস বন্ধ। ফ্লাডে রাস্তা উড়ে গিয়েছে।'
'সে কী!' চিন্তায় পড়ে গেলাম।
'পাঁচ ক্রোশ রাস্তা। যেতে পারবেন না জলের জন্যে। খুব তাড়া আছে?'
'হ্যাঁ। আছে বলেই তো এসেছি।'
'তা হলে ট্রেন লাইন ধরে চলে যান। এক ক্রোশ কম পড়বে। এই লাইন একেবারে হৃদয়পুরের গা দিয়ে গিয়েছে।'

অতএব প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে রেললাইনে নামলাম। দুই লাইনের মাঝখানে পাতা কাঠের ওপর পা ফেলে হাঁটছি। এক সময় স্টেশনটা আড়ালে চলে গেল। দু'পাশে জল আর জল। কোথাও মানুষের কোনও চিহ্ন নেই। হাঁটছি তো হাঁটছি। জলে বাতাস ছোট ঢেউ তুলছে। মাছরাঙা সেই ঢেউ-এ ছোঁ মার ছে। হৃদয়পুর কত দূর?

হঠাৎ লোকটাকে দেখতে পেলাম। গ্রামের মানুষ। মাথায় গামছা বাঁধা, উল্টো দিক দিয়ে হেঁটে আসছে। কাছাকাছি হতেই চেঁচিয়ে জানতে চাইলা ম, 'ভাই, হৃদয়পুর কত দূর?'

লোকটা কাঁধ ঝাকাল, একটাও কথা না বলে পাস দিয়ে চলে গেল। প্রথে ম অভদ্র ভেবেছিলাম, পরে মনে হল বেচারা হয়তো কথা বলতে পারে না। খানিক বাদে আর এক জনকে দেখলাম আসছে। একই প্রশ্নের জবাবে একই অভিব্যক্তি। পাশ দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে লোকটা, তখন অবাক হলাম, অবিকল আগের লোকটার মতো দেখতে। যমজের এক জন যদি বোবা হয় তা হলে অন্য জনও কি কথা বলতে পারে না?

আবার হাঁটছি। কিছুক্ষণ বাদে তৃতীয় ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল। মাথায় গা মছা বাঁধা। তাকে খুব মোলায়েম গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাই, হৃদয়পুর কত দূর?' আমাকে অবাক করে দিয়ে সে যখন কাঁধ নাচালো তখন দেখলা ম আগের দু'জনের মুখের সঙ্গে এর মুখের কোনও পার্থক্য নেই। আমি ম কখনও ত্রিমজ মানুষ দেখিনি। ত্রিমজরাও কি বোবা হলে একসঙ্গে বোবা হয়?

কিন্তু তিন জনেই জানাল, অভিব্যক্তিতে জানাল, হৃদয়পুর কত দূর তা তার া জানে না। তা হলে কি আমি ভুল পথে চলছি। পেছন ফিরলাম। স্টেশন দেখা যাচ্ছে না, লোক তিনটেকেও নয়। হঠাৎ পায়ের তলার পাটাতন কেঁপে উঠল। হু হু করে ট্রেন ছুটে আসছিল। কোনও রকমে লাফ দিয়ে লাইন থেকে সরে এলাম। এটা মেল ট্রেন বোধহয়। চরাচর কাঁপিয়ে চলে গেল।

তার পর আবার সব শান্ত। আমি রেললাইনে উঠলাম। এবং তখনই চোখে

পড়ল সামনে এক জন এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটির পেছন আমার দিকে থাকায় মুখ দেখতে পারছি না। কিন্তু ওর হাতে স্যুটকেস, পরনে শার্ট প্যান্ট, যা আমার পরনে। এ কোত্থেকে এল ভাবতে ভাবতে পা বাড়াতে গিয়ে দেখলাম আমি এগোতে পারছি না। লোকটি এগিয়ে চলেছে, চলেছে।

গল্প তিন

চার জনের জন্য বরাদ্দ এই কুপেটাকে এমন খালি পাব ভাবিনি। যদিও এই ট্রেনটায় বেশি যাত্রী দেখলাম না প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পরে। এ রকম একটা ছোট্ট ঘরে একা সারারাত ছুটন্ত অবস্থায় কাটবে ভেবে পুলকিত হচ্ছিলাম। ট্রেন ছাড়তে যখন কয়েক মিনিট দেরি তখন টিকিট-পরীক্ষক এসে আমার স্বাধীনতাকে চাঙ্গা করে গেলেন।

আমি গুছিয়ে বসলাম। দরজা ভেজিয়ে খাবারের বাক্স, জলের বোতলের সঙ্গে হুইস্কির বোতল বের করলাম। রাতের খাবার খাওয়ার আগে দু'পাত্র পান করা আমার অভ্যেস।

ট্রেন যখন কেঁপে উঠল ঠিক তখনই বন্ধ দরজায় যেন ঝড় আছড়ে পড়ল। মহিলার বাজখাঁই গলা কানে এল, 'উত্‌রাও, উত্‌রাও, সিটকে নীচে রাখো, জলদি।' একগাদা লটবহর কুলিরা সিটের তলায় ঢুকিয়ে টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি হুইস্কির বোতলটাকে আমার পায়ের পাশে সিটের নীচে সরিয়ে দিলাম। এ বার ওঁরা ঢুকলো। মহিলা লম্বায় অনেকটা, প্রস্থেও। পেছনে টিকটিকির মতো একজন মানুষ যার গায়ের রং ধবধবে সাদা, পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি-পাজামা। বয়স পঞ্চাশের অনেক ওপরে। দাঁড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। মহিলা ধমকালেন, 'আঃ! ওখানে কী করছ। বিছানা পেতে ফ্যালো।' ট্রেন ছাড়ল।

ভদ্রলোক যখন কাজ করছেন তখন মহিলার খেয়াল হল আমিও এখানে আছি। ঘুরে দাঁড়ালেন। ফলে ভদ্রলোক আড়ালে চলে গেলেন, 'আপনি?'

‘এক জন যাত্রী।’ বললাম।
‘সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কদ্দুর যাবেন?’
‘শেষতক।’
‘যাক বাঁচালেন। মাঝরাতে দরজা খুলে নেমে গেলে টের পেতাম না।’ চাদর পাতা সিটে বসলেন মহিলা, ‘আপনার টয়লেট হয়ে গিয়েছে?’

চমকে উঠলাম। আজ পর্যন্ত, সেই শৈশবকালের পর, এমন প্রশ্ন কোনও মহিলার মুখে শুনিনি। মাথা নেড়ে না বলতেই তিনি বললেন, ‘দয়া করে যান, আমি চেঞ্জ করব।’

বেরিয়ে এলাম কুপে থেকে। বুঝলাম রাতটার বারোটা বেজে গেছে। আধ ঘণ্টা বাদে নক্ করে ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম আহারপর্ব চলছে। লুচি মাংস মিষ্টি। আমার জায়গায় বসা মাত্র প্রশ্ন ছুটে এল, ‘খাবেন না?’
‘রাত হোক, ন’টা বাজুক।’ বললাম।
‘আমি কিন্তু আলো জ্বালিয়ে ঘুমাতে পারি না।’ খাওয়া শেষ করে মহিলা বললেন তাঁর সঙ্গীকে, ‘যাও বেসিন থেকে এ সব ধুয়ে আনো।’

সঙ্গী টিফিনক্যারিয়ারের বাটিগুলো নিয়ে সুড়ুত করে চলে গেলেন।

‘আপনি ম্যারেড?’
‘না।’
‘তবু ভাল। আপনার বয়সের বিবাহিত পুরুষদের বিশ্বাস করা যায় না।’ মহিলা বলা শেষ করতেই টিকটিকি ফিরে এলেন। মহিলা বললেন, ‘যাও ওপরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। ভোর হলে একবারে বাথরুমে যাবে।’
টিকটিকি ওপরে উঠে গেল।

মহিলা আলোর সুইচ পরীক্ষা করে তেজি আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বেলে বললেন, ‘ভূতের মতো জেগে বসে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।’ তার পর নীচের সিটে শরীর এলিয়ে দিলেন। একটু পরে আমার দিকে তাঁর শরীরটা পেছন ফিরল। ওপরে টিকটিকি নিঃসাড়ে পড়ে আছেন। ট্রেন চলছে।

হঠাৎ কানে আওয়াজ এল। ট্রেনের চাকার শব্দ অতিক্রম করে মহিলার নাসিকা যে শব্দ তুলছে তার কোনও তুলনা নেই। ট্রেনের গতি কমে এলে গর্জন বাড়ছে। বুঝলাম এখন ওঁর ঘুম সহজে ভাঙবে না। অতএব এখন পান করা যেতেই পারে।

হাত নামিয়ে বোতলটাকে খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম ওটা পড়ে গেছে। তারপর আবিষ্কার করলাম ধাক্কা খেয়ে দু’টুকরো হয়ে ছিল। আর তুলতেই একটা

টুকরো ওপরে উঠে এল এবং অ্যালকোহলের গন্ধে চারপাশ ম’ ম’ করে উঠল। কিন্তু তাতে মহিলার ঘুম একটুও চটকাল না। ভাগ্যিস বোতলটা ছোট ছিল তাই স্যুটকেসগুলোই ভিজেছে, বাইরে আসেনি। মন খারাপ হয়ে গেল।

এই সময় টিকটিকি উঠে বসল ওপরের বার্থে। তার পর একটা কাঠের বাক্স সামনে এনে দেখতে লাগল। একটা হোমিওপ্যাথির শিশি বাক্স থেকে তুলে আমার দিকে তাকাল লোকটা। চোখাচোখি হতে ইশারায় কাছে যেতে বলল। আমি উঠে সামনে যেতে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘জল মেশানো আছে।’

তাকিয়ে দেখলাম ওটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স। তাতে অনেক শিশি। ছিপি খুলে তরল পদার্থ মুখে ঢালতেই হুইস্কির স্বাদ পেলাম। টিকটিকির মুখে তখন মন্থরার হাসি। তিনিও এক শিশি তরল পদার্থ মুখে ঢেলে একটু ঝুঁকে ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

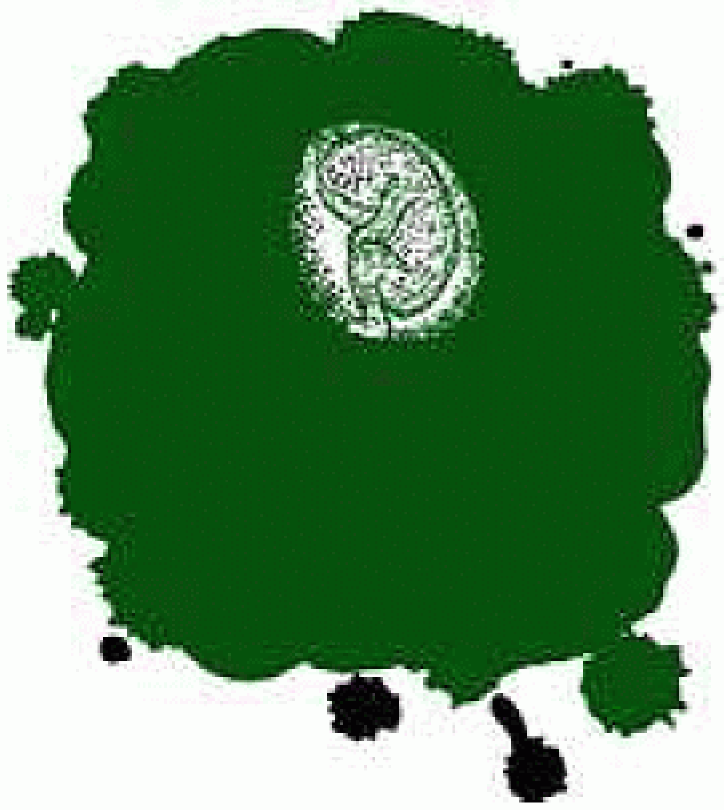

গল্প চার

‘স্নেহের খোকা। গতকাল তোমার পত্র পাইয়াছি। সব খবর জানিয়া মন শান্ত হইয়াছে। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি কেমন আছি। পঁচাত্তর বয়সে শরীরে নানান রোগ এবং ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া যে রকম থাকা উচিত তেমনও থাকিতে পারিতেছি না। তোমার পিতৃদেব যত বৃদ্ধ হইতেছেন তত আমাকে জ্বালাইয়া মারিতেছেন। এই কর্ম তিনি গত পঞ্চাশ বছর ধরিয়াই করিয়া আসিতেছেন এবং এত দিনে আমার হাড়ে দূর্বা গজাইবার কথা। আমি বলিয়াই কোনওক্রমে টিকিয়া আছি। এখন তাঁহাকে শোষক ছাড়া কিছু মনে হয় না। তিনি তোমার পিতা! পুত্রের কাছে পিতার নিন্দা করা উচিত নয়। অনেক দুঃখে করিলাম।

তবে মাঝে মাঝে তিনি আমার কথা শোনেন। চোখে ভাল দেখি না বলিয়া এই পত্র আমার কথা শুনিয়া তিনিই লিখিয়া দিতেছেন।

তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিও।
ইতি আশীর্বাদিকা,
তোমার মা।'